বালিয়াটি জমিদার বাড়ি

● **ইশরাত জাহান উর্মি**

সময় একবেলা। মনটা স্টাক হয়ে ছিল। কিছুতে থামছিল না মনের শ্রাবণ। কার কার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যেন আগেই দেখেছিলাম মানিকগঞ্জের বালিয়াটি জমিদার বাড়ির ছবি। ঠিক হলো, মনের শ্রাবণ থামাতে বালিয়াটিই যাব। দেখা যাক কী হয়।

এক শনিবার সকালে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি, সাব্বির, আমাদের সোয়া দুই বছরের কন্যা নহলী ঊষশী খান আর ওর গর্ভন্যান্স কাম জানপাখী যার প্রকৃত নামও পাখী-ই– আমরা এই চারজন। গাবতলী পার হতেই মনের শ্রাবণ একটু একটু থামে। বর্ষা গিয়ে সবে এসেছে শরতরানী। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা।

আমরা বালিয়াটির লোকেশনের খোঁজ করি। পেয়েও যাই দ্রুত, তথ্যপ্রযুক্তি আর মোবিলিটির এই কালে কোনো কিছুই অনাবিষ্কৃত নয়। ধামরাই পার হয়ে কালামপুর বাসস্ট্যান্ড। সেখানে চায়ের দোকানে জানতে চাই বালিয়াটি কোথায়? সাঁটুরিয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেয় লোকজন। একজন বলে, আরেকটা বাজার পড়বে তারপর ঠিক ১৫ কিলোমিটার। এত নির্দিষ্টভাবে বলায় একটু অবাক হই এবং বুঝতে পারি জায়গাটা এরইমধ্যে ফেমাস হয়ে গেছে।

নির্দেশিত পথে ঠিকই মিলে যায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় থাকা বালিয়াটি জমিদার বাড়ি। আহ কী বিশালত্ব। সিংহদরজার বাইরে সবুজ টলটলে পানির শানবাঁধানো পুকুর। এখনও ব্যবহার হচ্ছে। লোকে নাইছে, কাপড় কাচছে। টিকিট কাউন্টারে তিনজনের টিকেট কেনা হয়। ২০ টাকা দাম টিকিটের। পঞ্চাশ টাকা গাড়ি পার্কিং। পুকুরপাড়ে গাড়ি পার্ক করি আমরা। জাদুঘর দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত লাঞ্চ ব্রেকের জন্য বন্ধ থাকে। আমরা পৌঁছেছি বারোটায়। দারোয়ান তাড়া দিয়ে বলে, তাড়াতাড়ি আসেন। মোট সাতটি প্রাসাদতুল্য ভবনে ২০০ কক্ষ। দ্বিতীয় ভবনে জাদুঘর। সেকালের বেলজিয়ামের দেয়ালজোড়া আয়না, মার্বেল পাথরের কারুকার্যময় টেবিল, ভারী ভারী সিন্দুক, বাচ্চাদের খাট...ইত্যাদি দেখনসই জিনিস। আমার এসবে অত মন টানে না, আমি একটু বাইরে গিয়ে আকাশ আর সবুজ দেখতে চাই। ঔপনিবেশিক স্থাপত্য কৌশলে তৈরি এই জমিদার বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধনাঢ্য লবণ ব্যবসায়ী গোবিন্দ রাম সাহার পূর্বপুরুষরা। মোট সাতটি প্রাসাদতুল্য ভবন আছে, সামনে তিনটি আগেই বলেছি। পুরো বাড়িটিই উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আওতায় পুরো ভবনটির জমি ৫ দশমিক ৮৮ একর। আমরা পুরো বাড়িটি দেখতে চাই। পাশাপাশি তিন ভবন। দুইপাশের দুটি ভবন অকৃত্রিম, মাঝখানেরটায় সম্ভবত পরে রঙ করা হয়েছে, সাদা রঙ। দেখতে ভালো লাগছে না। সামনের ভবনগুলো মোটামুটি রক্ষণাবেক্ষণের যত্ন পেলেও পেছনের ভবনগুলো মনে হয় না তা পায়। বাড়ির একদম পেছনে সবজি খেত। দুইপাড়ে শানবাঁধানো ঘাটের একটা পুকুর। এই পুকুরের পানি হেজে-মজে গেছে। তবু দৃষ্টিনন্দন। পুকুরপাড়ে সম্ভবত চাকর-নোকরদের থাকার বাসস্থান ছিল এককালে, এখন সেসব ঘরে শত শত বাঁদুড়ের কিচিরমিচির। ঘরগুলোতে ওঠার জন্য উঁচু সিঁড়ি। আমরা গরম থেকে বাঁচতে খানিকক্ষণ সিঁড়িতে বসি। পুকুরপাড়ে ছবি তুলি। তারপর আবার ফিরে আসি সামনের দিকটায়। একদম শেষ ভবনের সামনের সিঁড়িতে বসি। ভাবি, কোনোদিন কি এসব সিঁড়িতে জমিদার বাড়ির মেয়েরা বসে গল্পগাছা করত? আমাদের মেয়েটা পাখীর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে খোলা জায়গা পেয়ে। গাছের বেড়ায় বসা প্রজাপতির পেছনে ছোটে, সিংহদরজার সিংহের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়। আমরা চুপচাপ বসে থাকি। ভবনের থামগুলোর সৌন্দর্য দেখি। পাখী একসময় জোরে ডাক দেয়, ডাকের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখি, মাঝখানের ভবনের বারান্দায় ভারী সুন্দর এক কাঠের জানালা। কারুকার্যময়। ও আর নহলী সেই কাঠের জানালা

দিয়ে মুখ বের করে। আমিও ছুটে যাই। জানালা দিয়ে আকাশ দেখি। আরো একটু বসতেই ইচ্ছা করছিল। কিন্তু গরম সেদিন ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাই বসা আর হলো না। বাইরের দোকান থেকে আইসক্রিম আর জুস কিনে আমরা ফেরার পথ ধরি। একবারে জাহাঙ্গীরনগর প্রান্তিকে এসে দুপুরের খাবার। মনের শ্রাবণ ততক্ষণে কোথায় উধাও!

যেভাবে যাবেন : ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জের সাঁটুরিয়া হয়ে একবারেই পৌঁছানো যায় বালিয়াটিতে। সময় লাগে ঘণ্টা দুয়েক। নিজস্ব গাড়ি না থাকলে বাসে সাঁটুরিয়া বাসস্ট্যান্ড নেমে যেতে হবে। সেখান থেকে লোকাল বাসে আধঘণ্টা লাগবে বালিয়াটি যেতে। সাঁটুরিয়া বাজারে খাওয়ার হোটেল আছে মাঝারিমানের। কয়েকঘণ্টার জার্নি, তাই চিন্তার বিশেষ কিছু নেই। ফিরতেও পারবেন একই ভাবে। ■